ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 693-692
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.057

মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য ধারায় অন্ত্যজ নারী ও আদিবাসী জীবন জিজ্ঞাসা

বিকাশ মণ্ডল, *স্বাধীন গবেষক, বালিগুমা, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 13.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Mahashweta Devi was one of the greatest novelist and fiction writers of Bengali language. She was also known to be an active social worker. That is why; she had the opportunity to observe the people different areas very closely, most of which are indigenous communities and which lies in the lower stratum' of society, like the Bagdi, Dom, Pakhamara, Ganju, Mal, Khariya, Bauri etc. Based on her real life experiences, she has created many literature by using the social life of those inferior communities which have represented different ethnicities in different fields. She emerged in Bengali literature in 1956 by writing 'Jhasir rani', an autobiographical fiction. Besides her novel she wrote many short stories wherein we find many tribal and subaltern women characters who always remonstrate against their social and sexual exploitation or deprivation. In her short story 'Droupadi', 'Shikar' we draw up the main protagonist two tribal characters who protest against their sexual exploitation. But in her 'Bayen' 'Rudali' 'Dhouli' she left a big question about social stigma against subaltern women. She spent most of her life with the indigenous tribal people and with the communities who were on the 'lower stratum' of Culture. In this article, we will try to highlight the 'life' and 'lore' of different tribal culture and subaltern women of the communities of 'lower stratum' in Mahashweta Devi's literature and it will also be discussed how she played her role to help them.

Keywords: Tribe, Subaltern women, Lifestyle, Deprivation, Suppression.

বাংলা সাহিত্যের ধারায় এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। অবিভক্ত বাংলাদেশের খ্যাতনামা লেখক, পণ্ডিত, বুদ্ধজীবী, সৃজনশীল পরিবারে ১৯২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মহাশ্বেতা দেবী ছিলেন একধারে কবি, শিল্পি এবং বিদ্রোহী সমাজকর্মীও। তিনি অনেক পরিচিতদের মধ্যে একজন কল্লোল আন্দোলনের অগ্রদূত ও বাংলা সাহিত্যের ধারায় একটি বিশিষ্ট আধুনিকতাবাদী আন্দোলনের সহযোদ্ধা। মহাশ্বেতা দেবীর পরিবারের মাতৃ ও পৈত্রিক দিক ছিল পণ্ডিত্য এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের বিশেষ অধিকারী। তিনি সাপ্তাহিক, প্রগতিশীল একাডেমিক লেখার সুবাদে একটি স্বাধীন পথ অনুসরণ করে নিজেকে একজন বিশিষ্ট কর্মী এবং লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। মহাশ্বেতা দেবীর বেশিরভাগ কাজই প্রান্তিক, নিম্নবিত্ত,

নিপীড়িত আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি এই সম্প্রদায়ের মহিলাদের উপর বিশেষ মনোযোগ দেন। কারণ তিনি লক্ষ করে দেখেছেন ঐ জনজাতির মানুষেরা প্রায়শই কাঠামোগত নিপীড়নের শিকার হয়। তিনি কেবলমাত্র লেখকই ছিলন না, আদিবাসী অধিকারের জন্য ভারতের অগ্রগণ্য কর্মীদের মধ্যে অন্যতম একজন। মহাশ্বেতা দেবীর লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ ও বই সক্রিয়তা এবং প্রবৃত্তির জন্য বিশেষ খ্যাতনামা। যে গুলি পাঠ করলে আদিবাসীদের সাথে জড়িত অনেক কিছুর মেলবন্ধন খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর পারস্পরিক সহযোগিতা ১৯৬৫ সালের দিকে 'পালামউ'-এর আদিবাসীদের সাথে শুরু হয়েছিল। তিনি উপজাতীয় এলাকায় ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছিলেন বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য রাজ্যে।

মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য ধারায় অন্ত্যজ নারী ও আদিবাসীদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। বাস্তব অভিজ্ঞতা নির্ভর সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিস্থাপন করে তিনি একাধিক কালজয়ী সাহিত্য সৃজন করেছেন, যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করেছে সাঁওতাল সহ অন্যান্য জনজাতিসমূহ। মহাশ্বেতা দেবী ১০০টিরও বেশি উপন্যাস এবং ২০টিরও বেশি ছোটগল্প সংকলন রচনা করেছেন। তিনি মূলত বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন। লেখকের অনেক লেখা/বই/সাহিত্যকর্ম বিদেশি (যেমন- ইংরেজি, জার্মান, জাপানি, ফরাসি এবং ইতালীয়) ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ভারতের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য ধারায় বারে বারে উঠে এসেছে ডোম, পাখমারা, ওঁরাও, গঞ্জ, মাল, খেড়িয়া, লোধা-শবর প্রভৃতি জনজাতির কথা। মহাশ্বেতা দেবী অন্ত্যজ নারী ও আদিবাসীদের জীবন উপজীব্য করে প্রচুর ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনা করেন। এসব লেখা নিয়ে একাধিক গল্পগ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্পগ্রন্থ হল 'শালগিরার ডাকে' (১৯৮২), 'ইটের পরে ইট' (১৯৮২), 'হরিরাম মাহাতো' (১৯৮২), 'সিধু কানুর ডাকে' (১৯৮৫) প্রভৃতি। জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি অতিবাহিত করেছেন অন্ত্যজ আদিবাসীদের সঙ্গে। উদ্দিষ্ট জনজাতির ভৌগোলিক পরিবেশ-পরিস্থিতি-অবস্থান, পার্থিব জীবন-যাপন প্রণালী, সুস্পষ্ট জীবন ধারা অনুধাবন এবং উপলব্ধিজাত জীবনাভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে তাঁর সৃজনী শিল্পে। সেই কারণে তাঁর একাধিক লেখা হয়ে উঠেছে অন্ত্যজ শ্রেণির ঐতিহাসিক দলিল। ইতিহাসের সমান্তরালে তিনি রচনা করেছেন জনবৃত্ত অন্বেষণের বিকল্প ইতিহাস। আর এই ইতিহাসের ভেতরেই সুপ্ত থাকে সমাজনীতি, অর্থনীতি এবং তার আনুষঙ্গিক আচার-আচরণ, সংস্কৃতি, দেশজ জীবন-ব্যবস্থা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি অন্তেবাসীদের সংগ্রামের মানসিক চেতনার বিকাশ ঘটাতেই বিকল্প এক ইতিহাসের উন্মোচন করেছেন। নানাবিধ কারণেই লেখক বিশেষভাবে নারীদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অন্ত্যজ ও আদিবাসী নারীচরিত্রে বহুমুখী প্রতিবাদী স্বর পরিলক্ষিত হয়। তাঁর সাহিত্যে লালিত নারীসমাজ অনন্যতায় ভাস্বর। বীর্যে, বুদ্ধিতে, সাহসে, প্রতিবাদ- প্রতিরোধে, প্রেমানুভূতি ও প্রেমাকাঙ্ক্ষায় নারীকে স্বমহিমাময় করে দেখার আর্তি বা আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করা যায় মহাশ্বেতা দেবী সৃষ্ট নারী চরিত্র সৃজনে। অবশ্য এসব কিছুর অধিকাংশ সম্ভব হয়েছে তাঁর বহুমুখী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-ধর্মীতার জন্য।

খ্যাতিমান লেখক এবং সংস্কৃতি ও মানবাধিকার কর্মীও ছিলেন মহাশ্বেতা দেবী, যা তাঁর সাহিত্য সম্ভারের বিষয়-বৈচিত্রতা এবং পরিপূর্ণতা দান করেছে। অরণ্যচারী জন-জীবন সৃজনে, তিনি 'সাব-অলটার্ন' ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছেন। উপজাতিদের বঞ্চণা ও বিভিন্ন সমস্যার কথায় প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর ছোটোগল্পগুলিতে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রান্তীয় গোষ্ঠীদের পরিবর্তন সাপেক্ষে, ভারতীয় সমাজ-রাজনীতি ভাবনার পরিবর্তিত

রূপচিত্র - যা আসলে বিপন্নতার দলিল এবং সাহিত্য রচনার আধারে স্থানীয় ইতিহাস সৃজনের নবোদ্ভূত কৌশল। আখ্যান গ্রন্থনে কেবল সমাজতত্ত্বই উঠে আসেনি, সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-কূল সমাজ-মনস্তত্ত্বর সন্ধান পান। আলোচ্য নিবন্ধে মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য ধারায় অন্ত্যজ নারী ও আদিবাসী সমাজের সংস্কৃতির পরিসর নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ তাঁর বেশিরভাগ লেখাই পাঠক ও সাধারণ শ্রেণির হৃদয় ছুঁয়ে যায়। তাঁর কথা হচ্ছে যে,

> 'আমি সর্বদাই বিশ্বাস করি যে, সত্যিকারের ইতিহাস সাধারণ মানুষের দ্বারা রচিত হয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সাধারণ মানুষ যে লোককথা, লোকগীতি, উপকথা ও কিংবদন্তিগুলি বিভিন্ন আকারে বহন করে চলেছে, তার পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে আমি ক্রমাগত পরিচিত হয়ে এসেছি।'[১]

প্রথম জীবনে সাংবাদিকতার পাশাপাশি তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্পনীতি সমালোচনা করে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখনী ধরেছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর লেখা 'হাজার চুরাশির মা', 'তিতুমীর', 'অরণ্যের অধিকার' অবিস্মরণীয় রচনা হিসেবে বাংলা সাহিত্যে স্বীকৃত। তাঁর লেখা উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে 'রুদালি'-র মত কালজয়ী সিনেমা। পরবর্তীকালে তিনি বামপন্থী রাজনীতির আন্দোলনের ধারা থেকে সরে আসেন, রাজা-রাজনীতিতে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় তাঁকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় দেখা যায়।

সাংবাদিক ও সৃজনশীল লেখক হিসেবেও কাজ চালিয়ে যান মহাশ্বেতা দেবী। পশ্চিমবঙ্গের লোধা ও শবর উপজাতি, নারী ও দলিতদের নিয়ে পড়াশোনা করেন। তাঁর প্রসারিত কথাসাহিত্যে তিনি প্রায়শই ক্ষমতাশালী জমিদার, মহাজন ও দুর্নীতিগ্রস্থ সরকারি আধিকারিকদের হাতে উপজাতি ও অস্পৃশ্য সমাজের অকথ্য নির্যাতনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। মহাশ্বেতা দেবী লেখার উপাদানগুলো সংগ্রহ করেছেন সমাজের সবহারানোদের মাঝ থেকে, দলিত-নিম্নশ্রেণির লোকের কাছ থেকে। আজীবন কাজ করেছেন এদের নিয়ে, পড়াশোনাও করেছেন। তাইতো এসব শ্রেণি নিয়ে তাঁর গর্ব। সগৌরবে বলতে পারেন-

> '...আমার লেখার কারণ ও অনুপ্রেরণা হল সেই মানুষগুলি যাদের পদদলিত করা হয় ও ব্যবহার করা হয়, অথচ যারা হার মানে না। আমার কাছে লেখার উপাদানের অফুরন্ত উৎসটি হল এই আশ্চর্য মহৎ ব্যক্তিরা, এই অত্যাচারিত মানুষগুলি। অন্য কোথাও আমি কাঁচামালের সন্ধান করতে যাব কেন, যখন আমি তাদের জানতে শুরু করেছি? মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার লেখাগুলি আসলেই তাদেরই হাতে লেখা।'[২]

গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে গ্রাম-বাংলার নিঃস্বজনের বেদনার প্রকৃত ছবিটা উপলব্ধি করেন মহাশ্বেতা দেবী। এসব বিষয়ে তিনি বিভিন্ন মহলে লেখা-লিখিও করেন। সরকার পক্ষকে জানান। তাঁদের এই সমস্যার কথা জানানোর অন্যতম মাধ্যম ছিল মহাশ্বেতার সাহিত্য কলম। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা ও অন্যান্য পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যা হিসাবে 'লোধা সংখ্যা', 'মুন্ডা সংখ্যা', 'ওঁরাও সংখ্যা' প্রকাশ করে সমাজে বিভিন্ন বার্তা দিয়েছেন। সামাজিক অবস্থান, সমাজ- সংস্কৃতিতে তাঁদের ভূমিকা, জীবনাচারণ প্রক্রিয়া প্রভৃতি দিকগুলি অনুপঙ্খভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তেমনি মুসলিম সমাজ নিয়েও তাঁকে কাজ করতে দেখা গিয়েছে। খেড়িয়া, লোধাদের সঙ্গে থেকে কাজ করার অভিজ্ঞতাও তাঁর রয়েছে। তাঁদের জন্য লড়াই করেছেন। মুন্ডা, খেড়িয়াদের সংগঠিত করাই ছিল তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ-জন নিজেরায় যাতে সংগঠিত হতে পারে বা স্বাবলম্বী হতে পারে সেদিকে মহাশ্বেতা দেবী বেশি করে নজর দিতেন। তাঁদের

আত্ম-উন্নয়নে মহাশ্বেতা দেবী কেবল পথপ্রদর্শকের কাজ করে গেছেন, নির্দেশকের কাজ নয়। সে কারণে জনজাতির মানুষেরা ও নারীরা স্বাবলম্বী হতে পেরেছে, এটাই ছিল তাঁর মনোবাসনা। তাদের সামাজিক স্বীকৃতি প্রদানে মহাশ্বেতা দেবীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। মেদিনীপুরে লোধা, শবর, পুরুলিয়াতে খেড়িয়া, শবরদের অস্তিত্ব বর্তমান। লোধাদেরকে সরকারী পক্ষ থেকে দেওয়া বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জনসাধারণকে সজাগ করেন। প্রফুল্ল রায় মহাশ্বেতা দেবীর এই কর্মক্রিয়া সম্পর্কে বলেছেন-

> 'সমাজের প্রান্তিক জনজীবন নিয়ে সমাজের একেবারে তৃণমূল স্তরে গিয়ে যে সমস্ত জনজাতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে তাঁদের জীবনকে শিল্পরূপ দিয়েছেন তা আমাদের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। বাংলা সাহিত্যে এমনকি আগে আমরা দেখিনি।'[৩]

বহুবার ভারতের উপজাতি মানুষদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। বিরসা মুন্ডার জীবনকাহিনি অবলম্বনে ১৯৭৭ সালে মহাশ্বেতা দেবী 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন। দলিতদের নিয়ে ইতিহাস লেখা হয় না কখনও, তারা আড়ালেই থেকে যায়। বাঙালির ইতিহাসেও তাই। আমরা অনাদেশের শাসকদের নিয়ে ইতিহাস লিখি, জয়গান করি। কিন্তু আজীবন যারা দেশের জন্য, এখানকার যারা আদিবাসি তাদের নিয়ে কয়টা লেখা হয়? কয়জন স্বীকৃতি পান? কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন এদের নিয়ে, আন্দোলন করেছেন দলিতদের অধিকার নিয়ে, রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে ব্যক্তিগতভাবেও লিখেছেন। নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালে লেখা 'হাজার চুরাশির মা' বহুল পঠিত ও চর্চিত। লেখাটির মধ্যে দিয়ে তিনি নিম্নশ্রেণির মানুষের দুঃখ ও দুর্দশার কথা তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুজাতা। সমগ্র উপন্যাসে তাঁকে একজন কঠোর মানসিকতার নারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি রাজনৈতিক মত ও আদর্শে বিশ্বাসী। যে আদর্শকে বিশ্বাস করে অবস্থাপন্ন পরিবারের সন্তান ব্রতী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লে তাকে প্রাণ হারাতে হয়। উপন্যাসের কতকগুলো অসম্পূর্ণ গতিশীল লাইন সেই দামাল সময় পর্বকেই যেন আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে-

> 'বন্দুকের নল থেকেই ... এই দশক মুক্তির দশক হতে চলেছে ... ঘৃণা করুন! চিহ্নিত করুন মধ্যপন্থীকে।... কেননা জেলই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়।'[৪]

মহাশ্বেতা দেবীর ব্যাক্তিগত জীবন সুখের ছিল না। প্রথম বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তিনি পরে আবারও বিবাহ করেন। এই সময়কাল অতিবাহিত করা তাঁর পক্ষে বেশ কষ্টকর ছিল। তবে বৈবাহিক জীবন সঞ্জাত অভিজ্ঞতা ভাণ্ডার পরবর্তী সময়ে তাঁর সাহিত্য জীবনকে নানাভাবে পরিপুষ্টি দান করেছে। তাঁর সংগ্রাম চলেছে সাহিত্যচর্চা এবং জীবনচর্চার মাধ্যমে। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই লেখক লিখলেন 'রুদালী', রাজস্থানের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের নারীকে নিয়ে, অর্থের বিনিময়ে মৃতের বাড়িতে গিয়ে কান্নাকাটি করে যারা। এই 'রুন্দালী' গল্পের নায়িকা শনিচরী, কলেরায় স্বামীর মৃত্যুতে অসহায়, স্বামীর জন্যে তার কাঁদা হয়নি, শাশুড়ির মৃত্যুর পরেও সে কাঁদেনি। কিন্তু তাঁকে অর্থ রোজগারের জন্যে এবাড়ি-সেবাড়িতে গিয়ে মাথা চাপড়ে চাপড়ে কাঁদতে হয়েছে। কান্নার রকমফেরে মজুরি ধার্য হয় যে সমাজে সেখানে শনিচরীরা তার স্বামী বা প্রিয়জনের জন্যে কীভাবেই বা কাঁদবে! লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যেমন সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, পাশাপাশি একথাও ঠিক, তিনি তাঁর উপলব্ধ সমস্যার সমাধান করারও চেষ্টা করেছেন প্রতি মুহূর্তে। তাঁর সমাজসেবী সত্তা তাঁর সৃজনীশক্তিকে ক্ষুন্ন হতে দেয়নি কখনও। তাঁর ছোট গল্প 'বাঁয়েন'-এ ভয়াবহ অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য চিত্র এঁকেছেন, যেখানে নায়িকা চণ্ডী

জাতিতে ডোম। চণ্ডীর বাবা ভাগাড়ের কাজ করত, অর্থাৎ কারও মৃত্যু হলে তার জন্যে গর্ত খুঁড়ে দিত। চণ্ডী তার বাবার মৃত্যুর পর সেই কাজ আরম্ভ করে। শবদেহ সৎকারের সূত্র ধরেই ওই গ্রামেরই বাসিন্দা মলিন্দরের সঙ্গে পরিচয় ও বিয়ে হয়। তাদের পুত্র ভগীরথের কখনও মনে হয়নি চণ্ডী বাঁয়েন কখনও কারও মা হতে পারে, দূর থেকে দেখেছে মাথায় লাল কাপড়ের ধ্বজা, উদভ্রান্তের মত ধানক্ষেতের আল ধরে চৈত্রের দুপুরে কাঠি দিয়ে টিন বাজাতে বাজাতে পুকুরের দিকে যাচ্ছে, পেছনে একটা কুকুর। ডোমদের মধ্যে একটি প্রচলিত সংস্কার ছিল, বাঁয়েন যদি কোনও ছোট ছেলে বা পুরুষকে দেখে, তখনই তাদের শরীর থেকে রক্ত শুষে নিতে পারে। অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার চণ্ডীকে স্বামী সংসার সন্তান থেকে সরে যেতে হয়, এমনকী নিজের স্বামী সন্তানের পরিচয় দেওয়াও নিষেধ ছিল। পুত্র ভগীরথ জানতেও পারে না তার মাতৃপরিচয়। সেই পরিচয় যখন উদ্ঘাটিত হয়, ভগীরথের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সেই চণ্ডী বাঁয়েন যখন নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে গ্রামের মানুষজনকে রক্ষা করে, তখন সেই সমাজই তাকে, সেই বিসর্জিত চণ্ডীকে তার আসল পরিচয় ফিরিয়ে দেয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের কাছে চণ্ডী তখন তাদেরই একজন হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়। এখানে নারীর প্রতি অন্ধ কুসংস্কারে জীর্ণ সমাজের অত্যাচার ও তার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ নিয়েই লেখকের সমাজ-সচেতন মন প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। মহাশ্বেতা দেবীর গল্প 'ধৌলি'তে এক আদিবাসী নারীর সঙ্কটময় জীবনকাহিনি অন্য মাত্রা অর্জন করেছে। বিশ্বাস-অবিশ্বাস, প্রেম ও বিশ্বাসঘাতকতার সকরুণ চিত্র স্পষ্ট সেখানে। ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন এলাকার ধৌলির স্বামীর মৃত্যুর পর তার ভাসুরের নজর এড়াতে সে চলে আসে তার মায়ের কাছে। সেখানে উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ মিশ্রিলালের প্রতি তার ভালোবাসা এবং গর্ভবতী হওয়া, তারপর মিশ্রিলালের মায়ের থেকে এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের থেকে স্বীকৃতি না পেয়ে, সর্বোপরি মিশ্রিলালের থেকে প্রত্যাখাত হয়ে একসময় সে পতিতাবৃত্তি বেছে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই ধরনের পথ নারীকে অবলম্বন করানোর জন্যে যে মিশ্রিলালরা দায়ী থাকেন, সেকথা সমাজে কখনওই বিবেচিত হয় না। সেই বাস্তব ছবিই ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক তাঁর কলমে। মহাশ্বেতা দেবীর আরেকটি শক্তিশালী গল্প 'দ্রৌপদী'। গল্পটি নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত মহাশ্বেতা দেবীর অনবদ্য সৃষ্টি। এই গল্পে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মেয়ে দ্রৌপদীকে লেখিকা প্রতিবাদী চরিত্ররূপে অঙ্কন করেছেন। মহাভারতের দ্রৌপদী যেমন রাজসভায় অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে ভারতীয় সাহিত্যে এক অসাধারণ প্রতিবাদী চরিত্ররূপে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। দ্রৌপদী চরিত্রটি বহুদিনের জমে থাকা অত্যাচার, উৎপীড়নের এক জ্বলন্ত বহিঃপ্রকাশ। দ্রৌপদী তার উপর ধর্ষণের প্রতিবাদ সে নিজেই করে। সে নিজেকে নগ্ন করে ফেললে সমস্ত রকমের বীরত্ব এবং বিক্রমের বর্ম খুলে পরে। ক্রোধে, ক্ষোভে উন্মত্ত দ্রৌপা অন্যরূপ আমরা দেখি।

> 'কাপড় কী হবে কাপড় লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে মরদ তু ... হেথা কেও পুরষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরতে দিব না। লে, কাঁউটার ক... দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়কে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।'[৫]

নারীরা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সর্ব বিষয়ে ক্ষমতানুযায়ী যথাযোগ্য সুযোগ পাবে এবং তাদের ক্ষমতানুযায়ী নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করবে বা নেতৃত্ব দেবে- এই ছিল মহাশ্বেতা দেবীর আকাঙ্ক্ষা। বিভিন্ন গল্পের নারী চরিত্রের মধ্যে আমরা সেই চেতনাবোধ লক্ষ্য করি। বীর্যে, বুদ্ধিতে, সাহসে, প্রতিবাদ- প্রতিরোধে, প্রেমানুভূতি ও প্রেমাকাঙ্ক্ষায় নারী চরিত্ররা স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রেখেছেন। এই

প্রসঙ্গে আমরা 'শিকার' নামক গল্পের কথা উল্লেখ করতে পারি। নারীদের প্রতি সমাজের অমানবিক আচরণের তীব্র প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হয়েছে এই গল্পে। সমাজে নারীদের প্রতি পুরুষের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পায়। গল্পের প্রধান চরিত্র মেরী নামধারী এক নারী। বাংলা সাহিত্যে সৃষ্ট অন্ত্যজ নারী চরিত্রের মধ্যে এই মেরীকে সামনের সারিতেই রাখা যায়। সে নারীর স্বাজাত্যবোধ, কর্মদক্ষতা, প্রেমাকাঙ্ক্ষায় সজীব। উচ্চবিত্ত সমাজের সম্ভোগলিপ্সু পুরুষরা প্রান্তীয় সমাজের নারীদের শারীরিক চাহিদা মেটাবার জন্য বেশিরভাগ সময় ব্যবহার করেন। মেরীর ওপরেও এমন কুদৃষ্টি পড়েছিল। তসিলদার তাকে পেতে চেয়েছিল। এমনই এক পরিস্থিতিতে আমরা মেরিকে প্রতিস্পর্ধী রূপে আবিষ্কার করি-

> 'তসিলদার তাঁবুতে বসে মেয়ে মরদকে পয়সা দিচ্ছিল। প্রচুর মানুষের ভিড়। তারই মধ্যে মেরী ঢুকে পড়ে ও জঘন্য গাল দিয়ে কাপড়টা ছুঁড়ে দেয়। বলে, শহরের রাণ্ডী পেয়েছিস আমাকে। কাপোড় দিয়ে ভোলাতে এসেছিস? ফের বদমাশি করবি তো নাক কেটে নেব। হাত দুলিয়ে ও বেরিয়ে যায় ও সগর্বে।'[৬]

মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য ধারায় একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে আদিবাসী মানুষ। আদিবাসীদের নিয়ে বাংলা ভাষায় আগেও লেখা হয়েছে, কিন্তু একজন লেখকের কলমে এতখানি লেখা আগে মেলেনি। তা ছাড়া, আগের লেখার কথা ও কথনরীতি মহাশ্বেতা দেবীতে অনেকখানি বদলে যায়। সে বদলের উৎস গত শতাব্দীর ষাটের দশকের নানা আন্দোলন, যার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল আদিবাসী অঞ্চল। মহাশ্বেতা দেবীর আদিবাসী যোগের সূত্রপাত ওই সময়ে। তা আরো নিবিড় হয় আট-দশ বছরে। তার প্রথম ফল ১৯৭৫-এ একটি পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 'অরণ্যের অধিকার'। সেই অধিকারের প্রশ্ন তারপর তাঁর লেখায় উচ্চারিত হতে থাকে নানা ভাবে এবং নানা প্রেক্ষিতে। ১৯৮২-তে প্রকাশিত হয় 'হুলমাহা' ও 'শালগিরার ডাকে'। 'অরণ্যের অধিকার'-কে জুড়লে দেশের একটি বিস্তৃত অংশের আদিবাসী জীবনকথা ধরা থাকে সাহিত্য ধারাতে।

সারা ভারত জুড়ে সাহিত্যগত যে আলোচনা, তার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। নিছক ভক্তি নয়, জ্ঞান ও কর্মকে তিনি তাঁর আদিবাসী চর্চা ও চর্যায় যুক্ত করেন। নিজেকে বদলান এবং বদলের চালিকা শক্তিও হয়ে ওঠেন। তাই তাঁকে নিয়ে, তাঁর সুজনকে নিয়ে নতুন নতুন পাঠ বইটির প্রথম আলোচ্য 'ইতিহাসে নিম্নবর্গের কণ্ঠ' এবং সে আলোচনা 'অরণ্যের অধিকার', 'হুলমাহা' ও 'শালগিরার ডাকে' উপন্যাস তিনটি নিয়ে। প্রথম উপন্যাসটিতে সারা উনিশ শতক জুড়ে মুন্ডাদের অরণ্যভূমি হারানোর ইতিহাস। শুরু আরও আগে, বিরসার ঠাকুরদার জন্মাবার কালে। ১৮৫৫ সালে ধানী মুন্ডা যোগ দেন সিদু-কানুর দলে মুন্ডাদের জমি রক্ষা করতে। তার চার দশক পরে বিরসা অরণ্যের অধিকার চান। সাঁওতালদের 'হুল' নয়, সর্দারদের 'মূলকই লড়াই' নয়, তিনি ডাক দেন 'উলগুলান'-এর, এক মহাবিপ্লবের। তার বিরুদ্ধে একযোগে দাঁড়ায় দিখুদের দল, পুলিশ এবং চার্চও। ১৯০০-তে ধরা পড়েন বিরসা এবং ফাঁসি হয় কয়েক মাস পরে। কিন্তু মুন্ডাদের অবদমিত স্বরে ততদিনে অধিকারের ধ্বনি প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছে। তাঁদের গানে, গল্পে, নতুন উপমায় গাঁথাও হয়েছে এই 'উলগুলান'- এর কথা। মহাশ্বেতা দেবী এই বিকল্প ইতিহাসের মানুষজনকে খুঁজছিলেন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। তাঁর নিজের অগ্নিময় সময় হয়তো তাঁকে খুঁজিয়ে নিচ্ছিল।

'হুলমাহা'-ও আর এক বিদ্রোহের ইতিহাস। জমিদার, মহাজন, নীলকুঠির সাহেব এবং কোম্পানি সরকারের শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে ছিল সেটা সাঁওতাল অভ্যুত্থান। বিস্তার পেয়েছিল দামিন, বীরভূম,

ভাগলপুর, হাজারিবাগ, মানভূমের বিস্তৃত অঞ্চলে। বিদ্রোহের নায়ক কানু মুর্মুর ফাঁসি হয় ১৮৫৬-তে। মৃত্যুর আগে 'হুলমাহা'-তে কানুর একটি কথা আছে আমি আবার আসব।' ইতিহাসের অংশ হয়েও এই উচ্চারণ কিন্তু অতীত নয়।

'শালগিরার ডাকে' আরও খানিক পিছনের কাহিনি, ১৭৫০-এর। সেই বছরই জন্ম হয়েছিল তিলকা মুর্মুর। তিলকার বয়স তখন পনেরো, কোম্পানির হাতে আসে বিহার-ওড়িশার ভার। তখন থেকেই তসিলদার-গোলদারদের শেকড়বাকড় ছড়ায় দূর-দূরান্তে। ১৭৭২-এ রাজস্ব আদায়ের শুরু এবং বিদ্রোহ নানা আদিবাসী অঞ্চলে। সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন তিলকা মুর্মু। তারপর কোম্পানির ফৌজের সঙ্গে নানান জায়গায় সংঘর্ষের পর আহত তিলকা বন্দি হন এবং তাঁর ফাঁসি হয় ১৭৮৫-তে। সনাতন তাঁর আলোচনায় দেখান, ঠাকুমার গল্পে এই পৃথিবীতে মানুষের জন্মবৃত্তান্ত শুনেছিলেন তিলকা। বাবার কথায় জেনেছিলেন সাঁওতাল জাতির ঐতিহ্য, সামাজিক বন্ধন এবং কৌমের মানুষজনের নৈকট্যের কথা। এই ইতিহাস তাঁর মধ্যে স্বপ্নের জন্ম দেয়। সে স্বপ্ন বাঁচার ও বাঁচানোর। তারই প্রতিষ্ঠা মহাশ্বেতা দেবীর এই উপন্যাসে। আবার তিলকা, কানু ও বিরসার তিন কাহিনির মধ্য দিয়ে বিদ্রোহের ধারাবাহিকতাকে চিহ্নিত করেন মহাশ্বেতা দেবী। এই জঙ্গম ইতিহাসের বিপরীতে কোম্পানির নির্মিত ইতিহাস বেশ যান্ত্রিক ফাঁসি, ফাঁসি এবং ফাঁসি। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের বাঁচার ইতিহাসের পাশে শাসকের ফাঁসুড়ের ইতিহাস সাজিয়ে দিয়েছেন মহাশ্বেতা দেবী।

'চোট্টি মুন্ডা ও তার তীর' (১৯৮০) উপন্যাসটিকে নিম্নবর্গের নিয়ন্ত্রিত বিদ্রোহের স্বর বলে চিহ্নিত করেছেন আলোচক। চোটির পূর্বপুরুষ পূর্তি মুন্ডা যেখানে যেতেন, সেখানেই মাটি থেকে অভ্র বা কয়লা বেরত। তাঁরই উত্তরপুরুষ হল চোটি, যে নামে একটি নদীও। সব সময়ে ওঁকে নিয়ে গল্প গজাচ্ছে। এও এক ইতিহাসের গড়ন, লিপি নিরপেক্ষ কথার কথা, যা মহাকথার জন্ম দেয়। নির্মিতির সঙ্গে যার যোগ আছে তা হল মহাকাব্যের, এমনকী চোট্টির তিরের সঙ্গে রাম বা অর্জুনের বাণেও মিল। তবে তার ব্যবহার চোট্টিতে গ্রিক মহাকাব্যের ঢালটির মতো। চোটি মুন্ডা কোনও বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন না, কিন্তু বিশ শতকের তৃতীয় থেকে সপ্তম দশক পর্যন্ত মুন্ডাদের কিছু তির ঠিক লক্ষ্যই ভেদ করে। সেই তিরের পিছনে চোট্টির কথা-মহাকথার যোগও থাকে।

মহাশ্বেতাদেবীর সাহিত্য ধারাকে আরো শক্তিশালী গড়ে তুলেছে তাঁর কালজয়ী বেশ কিছু সাহিত্য সম্ভার। 'শিকার' গল্পে মহাশ্বেতা দেবী অন্তেবাসী মানুষদের প্রতিরোধস্পৃহাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন সুরে রূপায়িত করেছেন। এই গল্পটি আদিবাসী ওঁরাওদের নিয়ে লেখা। এই গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্রি মেরী ওঁরাও। মেরী ওঁরাও সাহেবের জারজ হিসাবে পরিচিত বলে তার সমাজ তাকে অনেক দূরত্বে ঠাঁই দিয়েছিল। মেরী অন্য আদিবাসীদের মেয়েদের মতো গতানুগতিক জীবন কাটাতে চায়নি। তাই প্রসাদ গিন্নী তার বিয়ের কথা বললে মেরী মুখের উপর বলে দেয়-

> 'ঝোপড়িতে থাকব, মরদ মদ খাবে, তেল সাবান পাব না, ফর্সা কাপড় পরব না, এমন জীবন আমি চাই না।'[৭]

ওঁরাও সমাজের চিরাচরিত সংস্কারকে ভেঙে দিয়ে সে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। তহশীলদার ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় শিকার। তাই গল্পের শেষে দেখি, তার ভালোবাসার বন্ধু জালিমকে নিয়ে

সে যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিল তহশীলদারকে হত্যা করে সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করেছিল। দিনটি ছিল তাদের শিকার পরবের দিন, মেরীর জীবনে সবচেয়ে আনন্দের দিন।

'সাঁঝ সকালের মা' গল্পে পাখমারা সম্প্রদায়ের পাখমারা সম্প্রদায়ের সাধন কান্দোরীর মা জঠি ঠাকুরানীর আশ্চর্য জীবনবৃত্তান্তের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী। জটেশ্বরীকে সূর্য ওঠার আগে এবং অস্ত যাওয়ার পর মা বলে ডাকার নিয়ম ছিল। তাই তাকে 'সাঁঝ সকালের মা' বলা হত। দিনের বেলায় সে জটি ঠাকুরানী। লেখিকা জটেশ্বরীকে একাধারে সাধনের মা এবং অন্যদিকে ঠাকুরানী নারী- এই দুইরূপে প্রকাশ করেছেন।

'গোহুমনি' গল্পে লেখিকা স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও পালামৌয়ের সুবিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে কিভাবে শ্রমিকদের উপর নানাভাবে শাসন, শোষণ, অত্যাচার করত তারই বাণীচিত্র ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে অরণ্যজীবী আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষদের সঙ্গে সমাজের নারীর বেদনার কথাও প্রচার করেছেন। এই গল্পে ঝালো ওরফে গোনুমনি নিজের অস্তিত্ব ও সামাজিক মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য লড়াই করতে ভয় পায়নি। ঠিকাদারের প্ররোচনায় পড়ে ঝালোর স্বামী বিশাল ভুইঞা বেশ কিছুদিনের মতো নিরুদ্দেশ থাকে। ঝালোকে জোর করে সমাজ বিধবা করেছে। সমস্ত যন্ত্রণা বুকে নিয়ে ঝালো বিশ্বাস হারায়নি, বরং সংগ্রাম করে গেছে এবং একদিন তার স্বামীকে সে ফিরে পেয়েছে। দৃঢ় বিশ্বাস, মনের জোর এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং লড়াই করে ঝালো সংসারের সুখ এনেছে।

'স্তনদায়িনী এবং অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পগুলিতেও নারীজীবনের মর্মবেদনা কাহিনি বিবৃত হয়েছে। 'জগন্নাথের রথ' শীর্ষক গল্পে আছে পূণ্যদাসীর বেদনাবিধুর জীবনের ইতিহাস, আছে তার বিশ্বাসের কথা। সমাজে এরা কতখানি উপেক্ষিতা, অবহেলিতা লেখিকা তাদের জীবনের সেই মর্মবিদারক দৃশ্যটিও তুলে ধরেছেন। 'বায়েন' গল্পে ভগীরথের সতমা যশির দুঃখদীর্ণ নারী জীবনের অসামান্য পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। বায়েন ওদের সমাজে ডাইনের মতো অপরাধী, তাদের দৃষ্টি খারাপ। সমাজ অকারণে তাদের শাস্তি দেয়, পাথর ছুঁড়ে মারে।

লেখিকার 'স্তনদায়ঃনী', 'ডাইনি', 'যশোমতি', 'বিশলাক্ষীর ঘর', 'হারুন সালেমের মাসি', 'যমুনাবতীর মা' প্রভৃতি গল্পগুলিতে আমরা নারীজীবনের করুনাঘন বেদনার্ত জীবনকাহিনির সঙ্গে পরিচিত হই। লেখিকা গজু, দুসাদ, ওঁরাও, মুন্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতিদের দুঃখদীর্ণ শোষিত, অত্যাচারিত এবং উৎপীড়িত জীবনকাহিনীর বাস্তব ইতিহাসকে প্রকাশ করতে গিয়ে তাদের সমাজের অসহায়, লাঞ্ছিতা নারীদের ব্যথাতুর জীবনের কথা বলতে ভুলে যাননি।

'ডাইনি' গল্পে দেখি হনুমান মিশ্রের ছেলে টুরা গ্রামের পহানের বোবা মেয়েকে নষ্ট করে। হনুমান মিশ্র সেই মেয়ে অর্থাৎ সোমরিকে নিজের ইচ্ছেমত বিধান দিয়ে ডাইনী করে দেয়। গ্রামে কোন বিপদ দেখা দিলে তারজন্য সোমরিকে দায়ী করা হয়। লেখিকা দেখিয়েছেন আদিবাসী গ্রামগুলি কিভাবে কুসংস্কারে আবদ্ধ। আরও দু'টি স্বরের কথা আলোচনা করেছেন সনাতন। এর একটি হল নারীকণ্ঠ, অন্যটি অপেক্ষাকৃত স্তিমিত কণ্ঠ। প্রথম অংশে আসে দ্রৌপদী, হুলমাহার মা, শনিচরী ইত্যাদি এবং দ্বিতীয়টিতে সাগোয়ানা ও অন্যান্য লেখা। আদিবাসী নারীদের নানা ভাবে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, ব্যবহৃত হওয়ার কাহিনি বর্ণিত মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যর ধারায়। এঁদের অনেককে তিনি কাছ থেকে দেখেছেন, এদের কথা শুনেছেন, নিজের নারী সত্তা

দিয়ে অনুভব করেছেন। দিমু, ইটভাটার মালিক, সশস্ত্র বাহিনী, এদের লুণ্ঠন করে। ডাইনি অপবাদেও মারে। তবু কেউ কেউ উঠে দাঁড়ায়। সেনানায়কের সামনে দাঁড়িয়ে ধর্ষিতা নারী এনকাউন্টারের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। ক্ষীণ স্বর তখন ঘন ধ্বনিকে অস্বীকার করে। এ ভাবেই শালগাছ প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় সেগুন বৃক্ষের।

সনাতন বিনির্মাণ তত্ত্ব, নিম্নবর্গের পাঠক্রম ইত্যাদির সঙ্গে ফরাসি দার্শনিক আল্যাঁ বাদিয়ুর চিন্তাকে তাঁর পাঠে সূত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বাদিয়ুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীর মেলেও অনেক জায়গায় এবং সে কারণে দর্শনের সূত্র দিয়ে সৃজনের গুরুত্ব বোঝা। অনেক জায়গায় মিলেছে ঠিকই, কিন্তু বেশ কিছু ক্ষেত্রে কষ্টকল্পিত মনে হয়েছে। সৃজন থেকে তত্ত্বগঠন আর তত্ত্ব দিয়ে সৃজন বোঝার মধ্যে উপার্জন ভিন্ন। কিন্তু সনাতন ভাওয়াল যত্ন ও সততারসঙ্গে বইটি লিখেছেন। সঙ্গে এটিও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসীদের কাছে শুধু যাননি, তাদের জন্য দরজাও খুলে রেখেছেন। দরজা বন্ধ থাকলে লেখার সময় নিজের কথা নিম্নবর্গের নামে ঢুকে পড়ে। এমন কত গল্প- উপন্যাসই না লেখা হয়েছে বিগত চার-পাঁচ দশকে। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর এ উপন্যাসের কৌয়ার, তেতরি ভূইন ও কসিলা চরিত্রগুলোকে বাস্তব ঘটনার আলোকে চিত্রায়িত করেছেন। ঘটে যাওয়া ঘটনাই এক সময় ইতিহাস হয়ে যায়, আর সেই ইতিহাস থেকে সংগৃহীত চরিত্রগুলো নিয়ে মহাশ্বেতার রচিত সাহিত্য ধারায় আর এক ইতিহাস।

শেষের কথা: মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যের ধারায় যে বাস্তব সমস্যা ফুটে উঠেছে তা বর্তমান সময়েও সমান প্রাসঙ্গিক। সমাজের উচ্চ ও নীচ ভেদাভেদ ও নানা ঘটনা মহাশ্বেতা দেবী কথাসাহিত্যে তুলে ধরেছেন। সমকালীন কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসেবে এই শোষিত নিপীড়িত মানুষের কাহিনীকে গ্রহণ করে। মহাশ্বেতা দেবীর কর্মপ্রয়াস কে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন অনেক সাহিত্যিক। মহাশ্বেতা দেবী উচ্চ ক্ষমতাসীন শক্তির বিরদ্ধে নিঃস্ব জনের হয়ে কলম ধরেছেন, অন্তজ প্রতিবাদী চরিত্র সৃজন করেছেন। তাঁর লেখা আদিবাসী জীবনভিত্তিক গল্পগুলি পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, লেখিকা আদিবাসী মহিলাদের জীবনের অন্দরমহলে প্রবেশ করে তাদের সুখ-দুঃখ-আনন্দ বেদনার একান্ত বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। আদিবাসী নারীদের শুধু বঞ্চনা, শোষণ নয়, সেই বনা থেকে পরিত্রাণের উপায় বাতলে দিয়েছেন দরদী লেখিকা। সাহিত্য চর্চার সমান্তরালে তিনি রচনা করেছেন জনবৃত্ত অন্বেষণের বিকল্প ইতিহাস যা হয়ে উঠেছে অন্ত্যজ শ্রেণীর ঐতিহাসিক দলিল। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনের সাহিত্য ও জীবনকে এক জায়গায় নিয়ে এসেছেন। তাঁর সাহিত্যে বাস্তব জীবনের শৈলী স্পষ্ট হয়ে ওঠে শিল্পসম্মতভাবে। সে আখ্যান অতীতেরও হতে পারে, আবার বর্তমান সময়ের হতে পারে। তিনি লেখক হিসেবে ছিলেন সাহসী ও প্রতিবাদী, আবার ব্যক্তি জীবনেও তিনি মানবদরদী ও প্রতিবাদী।

তথ্যসূত্র:

১. দেবী, মহাশ্বেতা, 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', দেজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তক মেলা, পৃষ্ঠা. ৬৯।
২. তদেব, পৃষ্ঠা. ৯৪।
৩. ধর, তপন (সম্পাদক), প্রসাদ, ৫০ বর্ষ, ২০১৬ সেপ্টেম্বর, পৃষ্ঠা. ১০।
৪. দেবী, মহাশ্বেতা, 'হাজার চুরাশির মা', কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০১৪, পৃষ্ঠা. ১৯।
৫. দেবী, মহাশ্বেতা, 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র' অষ্টম খণ্ড, দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা, ২০০৩, পৃষ্ঠা. ৪১৮ ।
৬. গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), 'মহাশ্বেতা দেবী গল্পসমগ্র' তৃতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪, পৃষ্ঠা. ২৩২ ।
৭. দেবী, মহাশ্বেতা, 'মহশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪, পৃষ্ঠা. ৪৬ ।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. দেবী,মহাশ্বেতা, 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', দেজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারি ২০০১।
২. দেবী, মহাশ্বেতা, 'নানা রসের ৯টি উপন্যাস', দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ২০১১।
৩. নন্দী, রতনকুমার সম্পাদিত, 'অরণ্যের অধিকার, লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষিত, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৫।
৪. ঘোষ, নির্মল, 'মহাশ্বেতা দেবী: অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ', করুণা প্রকাশনী, বইমেলা, ১৯৯৮।
৫. দেবী, মহাশ্বেতা, 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', অষ্টম খণ্ড, দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা, ২০০৩।